দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

# নাগরিক

প্রথম বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • ১৩ মে ২০২৪

## ভিতরের পাতায়


- প্রধানমন্ত্রী ও নির্বাচন কমিশন -১
- অর্থনীতি চরম বেহাল মোদীর আমলে - ২
- স্বদেশী আন্দোলন, হিন্দু–মুসলমান সম্পর্ক এবং রবীন্দ্রনাথ - ৪
- ভারতের নির্বাচন কেন বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ - ৬
- সন্দেশখালির নোনা ভেরির সবুজ স্বপ্ন - ৮
- লোকসভা নির্বাচনে ব্রাত্য যারা - ৯
- গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই - ১১
- অধিকার, গণতন্ত্র আর সংবিধানের প্রশ্নেই আসামে নির্বাচন - ১৩
- দ্বিতীয় দফার ভোটের পরে - ১৫
- ভোট কাকে দেবেন, কেন দেবেন - ১৭
- মোদীর বিদায় দেরি নেই - ১৯
- এসইউসিআই (সি) প্রার্থীর প্রতিরোধ - ২০


সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com

ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

## প্রধানমন্ত্রী ও নির্বাচন কমিশন

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা, তাদের দায়িত্ব অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। টিএন শেশন বলেছিলেন, 'নির্বাচন কমিশন স্বাধীন সংস্থা, প্রধানমন্ত্রীর আজ্ঞাবহ নয়।' নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলিকে একটি আদর্শ আচরণবিধি মেনে চলতে হয়। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সব দল বা ব্যাক্তির ওপর এই আচরণবিধি কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা। ধর্মের নামে ভোট চাওয়া বা কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রথম দফার ভোট পর থেকে প্রধানমন্ত্রী ক্রমাগত মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা করে চলেছেন। তিনি বলেছেন, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারে নাকি আছে তারা ক্ষমতায় এলে হিন্দু মহিলাদের সোনার গহনা ও মঙ্গলসূত্র কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের দিয়ে দেবে। তিনি মুসলমানদের অনুপ্রবেশকারী ও অধিক সন্তান উৎপাদনকারী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস হিন্দুদের কাছে থাকা অর্ধেক গবাদিপশু কেড়ে নেবে। তফশিলি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ কমিয়ে তা মুসলমানদের দেবে। প্রধানমন্ত্রী ভোটে জেতার জন্য নিজের দেশের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অসংখ্য অভিযোগ সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন নীরব দর্শক। আরেকটি রহস্য, কমিশন প্রথম দফায় ভোটদানের হার জানাতে ১১ দিন সময় নিয়েছে। এনিয়ে প্রশ্ন তোলায় কমিশন ক্রুদ্ধ। বিরোধী দলের ও নির্দল প্রার্থীদের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা করে নির্বাচনে লড়ার আশা এখনও সুদূরপরাহত।

# অর্থনীতি চরম বেহাল মোদীর আমলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৪ সালের এই লোকসভা ভোটের সময়ে, কেন্দ্র সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া থেকে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে। এই টাকা নেওয়ার পর, আরবিআই-এর আর্থিক সঞ্চয় মাত্র ৩০ হাজার কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। দেশের প্রধান নিয়ন্ত্রক ব্যাঙ্কের আর্থিক পুঁজি এতটা কমে যাওয়ার ফলে শুধুমাত্র আরবিআই নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলোর আর্থিক ভাঁড়ারে বিরাট টান পড়তে চলেছে শুধু তাই নয়, আরবিআই নিজেই আর্থিকভাবে দেউলিয়া হওয়ার পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে। এই ঘটনা পুরো দেশের জন্য একটা বিরাট বিপদঘণ্টা নয় কি?

কেন এবং কিভাবে এই বিপদ হল? একটু তলিয়ে দেখা যাক।

এটা স্বাভাবিক যে দেশের সাধারণ মানুষদের অনেকেই এই অর্থনৈতিক সর্বনাশ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করবেন না, কারণ তাঁরা অর্থনৈতিক বিষয়ের বদলে চেয়ে বেশি করে ধর্মীয় মাতামাতি নিয়েই এখনও মজে আছেন। এমনকি তাঁদের অনেকের হয়তো এটাও জানা নেই যে, ২০১৪ সালের আগে একটিবারও কোন কেন্দ্র সরকার আরবিআই-এর 'উদ্বৃত্ত অর্থ' তথা 'সামগ্রিক লাভ' কখনও এভাবে চেটেপুটে খায়নি বা খেতে চায়নি। কেবল একটা অংশ মাত্র ডিভিডেন্ড হিসেবে টুকটাক সরকার নিয়েছিল। ২০১৮ সালে যখন উর্জিত প্যাটেল আরবিআই-এর গভর্নর ছিলেন, মোদি সরকার আরবিআই-এর মোট লাভের পুরো অর্থটাই দাবী করে। কিন্তু উর্জিত প্যাটেল ভারতের আইন অনুযায়ী মোদির সেই অন্যায় দাবী মানতে অস্বীকার করেন। যার ফলে গভর্নর-পদ থেকে সে সময় উর্জিত প্যাটেলকে পদত্যাগও করতে হয়।

এরপরেই, সরকার পূর্বতন আরবিআই গভর্নর বিমল জালান'কে চেয়ারম্যান করে একটি ৬ সদস্যের কমিটি তৈরি করে এবং এভাবেই সরকার তার দাবি পূরণের রাস্তা সুগম করে ফেলে। এই ঘটনার আগে পর্যন্ত, কেন্দ্র সরকার দ্বারা সর্বোচ্চ ৫০-৫৫ হাজার কোটি টাকা অবধি ডিভিডেন্ড হিসেবে আরবিআই থেকে নেওয়ার ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সময়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন আরবিআই থেকে প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা নেওয়ার সরকারী আর্জি জানান, ভারতের সর্বোচ্চ ব্যাঙ্ক আরবিআই সেই আর্জি সোজাসুজি প্রত্যাখান করেন এবং সে সময়ের কেন্দ্র সরকার তা মেনেও নিয়েছিল।

মোদি সরকার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে শুধু দেশের গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরনো ব্যাঙ্কিং আইন পাল্টে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ইতিমধ্যে তারা ৩২৩ থেকে ৩২৭টি শিল্প-আইনের ধারাও পাল্টে দিয়েছে, যাতে বেশ কিছু কর্পোরেট ও কোম্পানীর প্রয়োজন ও নিয়োজনে কালোকে সাদা প্রমাণ করা সহজ হয়। গত তিন থেকে পাঁচ বছরে প্রায় ৫০ হাজার কোম্পানী আর্থিকভাবে দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে। যার ফলে সেই সব কোম্পানীকে দেওয়া ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ বা লোন সবটাই ডুবে গেছে। সেই ফাঁকে নতুন করে ব্যাঙ্কের লোন তথা পুঁজি হাতিয়ে গজিয়ে উঠেছে নতুন ৭০ হাজার কোম্পানী। এই হল মোদি সরকারের অর্থনীতির হাল-হকিকৎ! আজ, যদি আরবিআই ৭৪ হাজার কোটি টাকার প্রত্যাশিত লাভ না করতে পারে এবং যেটুকু ছিটেফোঁটা তার সঞ্চয়ে বেঁচে আছে সেটাও

কেন্দ্র সরকার এভাবে বাগিয়ে নেয়, তাহলে ডুবতে বসা ব্যাঙ্কগুলোকে কে বাঁচাবে?

আপনাদের হয়তো মনে আছে লক্ষ্মী বিলাস ব্যাঙ্ক, ইয়েস ব্যাঙ্ক, ডিএইচএফএল নামগুলো। লক্ষ্মী বিলাস ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে সিঙ্গাপুর ব্যাঙ্কের কাছে। বাকি দুটো ব্যাঙ্কও বিপজ্জনক অবস্থায় ধুঁকছে। সেই সঙ্গে অন্য আরও দুটো ব্যাঙ্ককে ক'দিন আগেই চেঁছেপুঁছে বেসরকারিকরণ করে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে, কুতুব মিনার আদিতে 'বিষ্ণু স্তম্ভ' কিনা বা জ্ঞানবাপি মসজিদে শিবলিঙ্গ ছিল কিনা এসব নিয়ে মাতামাতি করার বদলে, আমাদের জন্য সম্ভবত অনেক বেশি জরুরি এবং যুক্তিসঙ্গত এটা জানতে চাওয়া যে, এই কেন্দ্র সরকারের এমন অর্থনীতি দেশকে ঠিক কোথায় দাঁড় করিয়েছে!

ভারতের আইন অনুযায়ী,যদি দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশন চার মাস ধরে লাগাতার বাড়তে থাকে তাহলে সরকারের উচিৎ সরাসরি আরবিআই-কে প্রশ্ন করা। বিপরীতে আরবিআই-এর কাজ, পরিস্থিতির যথাযথ ব্যাখ্যাসহ সেই সরকারি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া। অথচ বাস্তবে আমরা দেখছি, গত ৬ মাস ধরে একটানা চড়চড় করে মুদ্রাস্ফীতি সূচক বেড়ে চলা স্বত্বেও সরকার আরবিআই-কে কোনও প্রশ্ন করার দায়িত্ব নেয়নি, আর আরবিআই কোনও উত্তর দেওয়ারও দায় দেখায়নি। এ নিয়ে সংসদে যে খোলা আলোচনা হওয়া উচিৎ ছিল সেটারও ব্যবস্থা করেনি সরকার। আজকের আরবিআই-এর পরিচালক মণ্ডলী বা বোর্ড যেহেতু এই সরকারেরই নিযুক্ত, কে আর করবে এই কাজের দায় স্বীকার?

উর্জিত প্যাটেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে এই সরকার কারণ এই সরকারের অন্যায় দাবি মানেননি উর্জিত। সেই জ্বলন্ত উদাহরণ সামনে দেখে কেই বা আর চাইবেন সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে বিরাগভাজন হতে? আবার উল্টোদিকে এও বলা যায় যে, এই সরকারের পছন্দসই আরবিআই বোর্ড সরকারকে তোল্লাই দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আরবিআই- কে এই স্তরে নামিয়ে এনেছে। ডক্টর মনমোহন সিংয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বের আট বছর (২০০৬-২০১৪) বনাম মোদি জমানার আট বছর (২০১৪- ২০২২) তথ্যের নিরিখে তুলনা করে দেখলেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ডক্টর মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বকালীন সরকার আরবিআই থেকে যেখানে নিয়েছে মাত্র ১,০১,৬৭৯ কোটি টাকা, মোদি সরকার সেখানে নিয়েছে ৫,৭৪,৯৭৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৫ গুণের থেকেও বেশি! আর এটাই হল 'প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে দুর্নীতির ধূর্ততা'!

এবার মানুষই সিদ্ধান্ত নেবে কে আসলে আরবিআই-কে টেনে এনেছে দেউলিয়া হওয়ার পথে।

*(অর্থনীতিবিদ শ্রী বিজয় ঘোরপাড়ে'র নিবন্ধ থেকে বাংলায় অনূদিত)*

তথ্য বিচারে এই প্রশ্নও উঠছে যে, ২০১৪ অবধি যে ভারতের বৈদেশিক ঋণ ছিল প্রায় ৫৫ হাজার কোটি টাকা, সেখানে গত দশ বছরের মোদি জমানায় এই বোঝা প্রায় চারগুণ বেড়ে যখন ২লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা হল, তখন এত নোটবন্দী, জিএসটি, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' আর 'সবকা বিকাশ' নিয়ে গলাবাজি করা মোদি সরকারের হাতে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিই বা কি হল, কতটা হল আর কোথায়ই বা হল!

# স্বদেশী আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং রবীন্দ্রনাথ

শুভ বসু

*অন্তিম অধ্যায়*

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গকে দেখেছিলেন হিন্দু এবং মুসলমান বাঙালির বিভাজন হিসাবে। সেই সময় তিনি একটি অনবদ্য দেশপ্রেমিক সংগীত রচনা করেন। সোনার বাংলা গানটি প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শন এবং বাউল পত্রিকায় ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। গানটির স্বরলিপি প্রকাশিত হয় সংগীত বিষয়ক পত্রিকা সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকাতে একই মাসে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সংস্কৃতি, অর্থিনীতি এবং গ্রামীণ উন্নয়নে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাংলার বিকাশ হবে, গড়ে উঠবে স্বদেশী শিল্প। সেই সঙ্গে তিনি হিন্দু-মুসলামানের রাখি বন্ধন উৎসব করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের কারণ ব্যাখ্যা করে ১৯০৮ সালে লেখা সদুপায় প্রবন্ধে বলেন,

'বাংলাদেশের যে অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া জানে সে অংশটি, খুব বড় নহে; তাহার মধ্যেও যে ভূভাগ ফলে শষ্যে উর্বর, ধনে ধান্যে পূর্ণ, যেখানকার অধিবাসীদের শরীরে বল আছে, মনে তেজ আছে, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ যাহাদের প্রাণের সার শুষিয়া লয় নাই, সেই অংশটি মুসলমান প্রধান; সেখানে মুসলমানের সংখ্যা বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিরল হইয়া পড়িতেছে। এমন অবস্থায় বাঙালির বাংলাটুকুকেও যদি এমন করিয়া ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশের মতো এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।'

আজকের দক্ষিণ এশিয়াতে এর পরিণতি কি আমরা জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাংলাভাগ বিরোধী আন্দোলন কি মুসলিম বিদ্বেষ প্রসূত? রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে বঙ্গদর্শন নবপর্যায় অশ্বিন ১৩১২ বঙ্গাব্দে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে লেখেন, 'আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাসে হিন্দু-মুসলমান বসে না; ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কি করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পর কে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রত্যাশা কোনো দিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।'

একথাকে কেউ নিশ্চই একজন হিন্দু সাম্প্রদায়িকের লেখা বলে ভাববেন না। প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন বাংলাদেশের শ্রেণী বিভাজন সম্পর্কে। তিনি জানতেন যে নমশূদ্র এবং মুসলমান প্রজাদের পক্ষে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিশ্বাস করা কঠিন। বহু প্রবন্ধে এই নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর ১৯০৮ সালে লেখা দুই বিঘা জমি বলে আখ্যান কাব্যে জমিদারের অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। ঘরে বাইরে উপন্যাসে তিনি তথাকথিত জাতীয়তাবাদের কৃষক বিরোধী চরিত্র উন্মোচিত করেছিলেন কিন্তু তবুও তিনি যে জমিদার সন্তান এবং জমিদারির পরিচালনা করেন এবং

কৃষকের রক্ত চোষক; এ বদনাম তাঁর ঘুচেনি।

রবীন্দ্রনাথ অসহায় ছিলেন। হিন্দু সমাজের মধ্যেও তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল একাকী। নিজের তৈরী শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচার্য্য আশ্রমে পর্যন্ত প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ ছাত্র অন্য ছাত্রদের থেকে পৃথক বসতেন এবং অন্য ছাত্রদের সেই ব্রাহ্মণ ছাত্রকে প্রণাম করতে হত। তিনি ধীরে ধীরে এই কূপমণ্ডূকতার অবসান করেন। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন অসমের করিমগঞ্জের এক সন্তান, সৈয়দ মুজতবা আলী।

এই সময় (১৯০৭-১৯০৯) রবীন্দ্রনাথ গোরা উপন্যাস লেখেন। অনেকে প্রশ্ন করেন গোরা উপন্যাসের গোরাকে কেন আইরিশ হতে হলো? কেন তিনি একজন মুসলমানের সন্তান হলেন না। কারণ রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের সময়ে ইংরেজের খায়ের খাঁ এক বাঙালি হিন্দুর পক্ষে মুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া প্রায় অসম্ভব। এবং এমন এক জাতির লোককে রবীন্দ্রনাথ বাছলেন যে-জাতির মানুষ ঠিক ইংরেজ নন বরং শ্বেতাঙ্গ হয়েও ঔপনিবেশিক শোষণে শোষিত আবার ভারতে ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত মানে আইরিশ। কাজেই সাহিত্যিকের এই নির্বাচনকে সাম্প্রদায়িক মনে করার কোনো কারণ নেই।

পরিশেষে সে যুগে রবীন্দ্রনাথের হিন্দু - মুসলমান প্রসঙ্গে একটি গভীর চিন্তাপ্রসূত বক্তব্য দিয়ে শেষ করি। ১৯১১ রবীন্দ্রনাথ কলকাতার বিডন স্ট্রিটে চৈতন্য গ্রন্থগারে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বলে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উল্লেখ্য, ১৮৯৮ সালে অ্যানি বেসান্ত বারাণসীতে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্টা করেন। ১৯০৫ সালে মদনমোহন মালব্য কংগ্রেস অধিবেশনে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের প্রস্তাব দেন এবং ১৯১১ সালে তিনি লিখিত প্রস্তাব দেন। রবীন্দ্রনাথ এই হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতাতে বলেন, 'একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত, তবে হিন্দু খুব খুশি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমান রূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কি করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইবে; কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন; কারণ যেখানে, কোন প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে, পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ।

আধুনিক কালে শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করে ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাদের সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মান-শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুর পক্ষে মঙ্গলকর।'

অবিভক্ত ঔপনিবেশিক বাংলায় খুব বেশি হিন্দু বুদ্ধিজীবী বা রাজীনীতিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের এপথে সহযোগী ছিলেন না। পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন সেই রকম এক বিরল ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের একাকিত্ব এবং গুরুত্ব সেখানেই, বোঝা যায় আমাদের দুই বাংলার ক্ষেত্রে।

(সমাপ্ত)

*লেখক টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক*

# ভারতের নির্বাচন কেন বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

মনজুরুল ইসলাম

নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের টাকাপয়সা খরচ করার বিষয়টি ভারতীয় উপমহাদেশের একটি পুরোনো রেওয়াজ। এ কারণে একটু অবস্থাপন্ন রাজনীতিকে-রাই নির্বাচনে দাঁড়ান; বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তানে সাধারণভাবে এটাই দেখা যায়।

টাকাপয়সা কম থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি মনোনয়ন পেয়ে যান, কোনো না কোনোভাবে তিনি সেটা ম্যানেজ করে ফেলেন; হয় দল থেকে অনুদান পান অথবা শুভানুধ্যায়ীরা সাহায্য করেন। আর কেউ যদি মন্ত্রী থাকেন বা এ রকম কোনো বড় দায়িত্ব পালন করেন, নির্বাচনে তাদের টাকাপয়সার সমস্যা হওয়ার কথাই না।

সম্প্রতি ভারতে একটি উল্টো ঘটনার খবর অনেকের নজরে এসেছে। পর্যাপ্ত টাকাপয়সা না থাকার কথা বলে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। (নির্মলা সীতারমণ সেস শি ডাজ নট হ্যাভ মানি টু কনটেস্ট লোকসভা ইলেকশন, ডিক্লাইনস বিজেপি টিকিট, হিন্দুস্তান টাইমস, ২৮ মার্চ ২০২৪)

ভারতে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির অর্থমন্ত্রীরই নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নেই! ভুলে গেলে চলবে না, নির্মলা সীতারমণ এর আগে বিজেপি সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। পরপর দুই মেয়াদে এ রকম দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা একজন মন্ত্রীর নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নেই; এমন খবরের তাৎপর্য কী?

টাকাপয়সা না থাকা নিয়ে নির্মলা সীতারমণের বক্তব্যে এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক, তিনি একজন সৎ রাজনীতিক এবং তাঁর দল এত 'গরিব' যে তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে পারছে না। পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত না থাকায় ব্যক্তি ও রাজনীতিক হিসেবে নির্মলার সততা-অসততা নিয়ে কিছু বলার সুযোগ নেই। কিন্তু তাঁর দল বিজেপি যে 'গরিব' নয়, সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

টাকাপয়সার অভাবে নির্মলা যেদিন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার বিষয়টি বলেন, তার বেশ কয়েক দিন আগেই ইলেকটোরাল বন্ড থেকে বিজেপির তহবিলে ছয় হাজার কোটি রুপিরও বেশি জমা হওয়ার কথা জানা গেছে। (বিজেপি রিসিপেন্ট নাম্বার ওয়ান, ইটস টপ টেন ডোনার্স ফ্রম থার্টি ফাইভ পারসেন্ট অব ইটস রুপি সিক্স থাউজেন্ড ক্রোর ইলেকটোরাল বন্ড কিট্টি, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২২ মার্চ ২০২৪)

ইলেকটোরাল বন্ড নিয়ে পানি অনেক দূর গড়িয়েছে। বিজেপি সরকারের করা অভিনব এই নিয়ম এরই মধ্যে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেছেন। ইলেকটোরাল বন্ডের মাধ্যমে কোন ব্যবসায়ী গ্রুপ কোন দলকে কত টাকা দিয়েছে, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক সেটা প্রকাশ করতে গড়িমসি করছিল। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনার পর তারা সেটা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। এতেই বিজেপির থলের বিড়াল বের হয়ে আসে।

ইলেকটোরাল বন্ড আসলে কী তা নিয়ে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলারই স্বামী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও লেখক পরকলা প্রভাকর। তিনি বলেন, 'নির্বাচনী বন্ড শুধু ভারতের নয়, সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্নীতি।' ('নির্বাচনী বন্ড পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্নীতি', বললেন অর্থমন্ত্রী নির্মলার স্বামী, আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন, ২৭ মার্চ ২০২৪)

পরকলা যেহেতু স্বয়ং অর্থমন্ত্রীর স্বামী, তাঁর এসব কথা বিজেপির জন্য অস্বস্তিকর। লক্ষণীয় হলো, ভারতে যারা বিজেপিকে ভোট দেন বা

সমর্থন করেন, তাঁরা অনেকেই এই দলকে 'দুর্নীতিমুক্ত' বলে দাবি করেন। কয়েক বছর ধরে নীতিনির্ধারকেরাও বিভিন্নভাবে দলটির সে রকম একটি ইমেজ তৈরি বা ন্যারেটিভ দাঁড় করার চেষ্টা করেছেন। প্রায় নিয়মিত তাঁরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। দুর্নীতির অভিযোগে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রেপ্তারও হয়েছেন।

অপর দিকে বিরোধীদের দাবি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে এসব হাঁকডাক আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁরা বরং উল্টো সরকারের বিরুদ্ধেই পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন। বিরোধী দল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধী ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'চৌকিদার চোর হ্যায়'। ইলেকটোরাল বন্ড,কাণ্ডের পর রাহুলের সেই কথা কি কিছুটা হলেও সত্যি প্রমাণ হলো?

ভারতের দুই বড় ব্যবসায়ী আদানি ও আম্বানির সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির সখ্যের বিষয়টি বহুল চর্চিত। কিন্তু ইলেকটোরাল বন্ডের মাধ্যমে অন্য করপোরেট কোম্পানিগুলো যে পরিমাণ অর্থ ভারতের ক্ষমতাসীন দলকে দিয়েছে, সেটির পরিমাণ সত্যিই বিস্ময়কর। এই অর্থ কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া হয়নি। এর বিনিময়ে তাঁরা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরও পাবেন বলে প্রত্যাশা করছেন। এটা মোটামুটি স্পষ্ট, ভারতে গত কয়েক বছরে অর্থাৎ মোদি-জমানায় রাষ্ট্র ও করপোরেট কোম্পানিগুলোর সুসম্পর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। রাষ্ট্র ও করপোরেট কোম্পানির এই সম্পর্ক কী ইঙ্গিত দেয়?

এ ক্ষেত্রে ইতালির স্বৈরশাসক বেনিতো মুসোলিনির সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, করপোরেশনের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিয়েই হলো ফ্যাসিজম (দ্য ডেফিনেশন অব ফ্যাসিজম ইজ দ্য ম্যারেজ অব করপোরেশন অ্যান্ড স্টেট)।

ভারতের ভবিষ্যৎ গতিমুখ বুঝতে হলে আবারও ফিরতে হবে পরকলা প্রভাকরের কাছে। অল্প কয়েক দিন আগে তিনি ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিক করণ থাপারকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেখানে তিনি তাঁর দেশের নির্বাচন ও ভোটাধিকার নিয়ে আশঙ্কার কথা জানান। (নো ফিউচার ইলেকশনস ইন ইন্ডিয়া ইফ পিএম মোদি রিইলেকটেড পরকলা প্রভাকর, দ্য হিন্দু, ৯ এপ্রিল ২০২৪)

এই সাক্ষাৎকারে সংবিধান ও দেশের ভবিষ্যৎ নিয়েও কিছু মন্তব্য করেন পরকলা প্রভাকর। তিনি বলেন, 'এমনটা হতে পারে, যদি এই সরকার ফের ক্ষমতায় আসে, তবে আর কোনো নির্বাচন হবে না দেশে। ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আশা করবেন না আর। এরপর আর কোনো ভোটই হবে না ভারতে। দেশের সংবিধান এবং নকশা পুরোপুরি বদলে যাবে। চিনতেও পারবেন না। লাল কেল্লা থেকে হিংসার কথা শোনা যাবে। ভয়ংকর হতে চলেছে দেশের ভবিষ্যৎ। যা আজ মণিপুরে হচ্ছে, তা আগামী দিনে দেশের যেকোনো স্থানে হতে পারে। কৃষকদের সঙ্গে যা হচ্ছে, লাদাখের মানুষের ওপর যা চলছে, তা গোটা দেশে হতে পারে।' ('লাল কেল্লা থেকে হেট স্পিচ! বন্ধ হবে নির্বাচন', সীতারমনের স্বামীর ভবিষ্যদ্বাণীতে অস্বস্তিতে বিজেপি, এই সময়, ৮ এপ্রিল ২০২৪)

পরকলা প্রভাকর যা বলেছেন, তা শুধু ভারতের জন্য নয়, বাংলাদেশের জন্যও আশঙ্কার বিষয়। ভারতের রাজনীতি, নির্বাচন বা গণতন্ত্র নিয়ে কেন আমাদের এই আশঙ্কা? এর কারণ হলো, ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। দেশটির সঙ্গে আমাদের বহুমাত্রিক সম্পর্ক রয়েছে। কোনো

কারণে ভারতে যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরও অবনমন হয়, তাহলে বাংলাদেশেও নিশ্চিতভাবে সেটার প্রভাব পড়বে। এর ফলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে যে সংকট চলছে তা আরও বাড়তে ও দীর্ঘায়িত হতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য তাই প্রতিবেশী হিসেবে গণতান্ত্রিক ভারতের কোন বিকল্প নাই।

*প্রথম আলো (২৩ এপ্রিল ২০২৪) থেকে পুনর্মুদ্রিত*

## সন্দেশখালির নোনা ভেরির সবুজ স্বপ্ন

দীপায়ন দে

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অন্তর্গত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সন্দেশখালি একটা জ্বলন্ত রাজনৈতিক পটভূমিতে পর্যবসিত হয়েছে। সাধারণ মানুষদের জনরোষ, প্রান্তিক চাষীদের ক্ষোভ এবং আতঙ্ক শুধুমাত্র যে তাদের নিপীড়ন, জায়গা জমি হাতছাড়া হওয়ার কারণে বা সামাজিক সুরক্ষা সর্বতভাবে ধ্বংস হওয়ার জন্য; তা কেবল নয়। তাদের মূল আতঙ্ক এই যে সন্দেশখালিতে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তাদের জীবন জীবিকা কোন পথে চলবে? সোজা কথায় পেটের ভাত জুটবে কিনা। এই সমস্যা অবশ্য সংবাদ মাধ্যমে খুব একটা চোখে পড়ে না, যত না রাজনৈতিক তরজা দৃষ্টিগোচর হয়। কিছু দিন আগে একটা যৌথ 'সত্য-তলব' দল সন্দেশখালির এক নম্বর এবং দুই নম্বর ব্লক পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছেন। মূল দুর্দশাগ্রস্থ জায়গাগুলতে, যেমন জেলিয়াখালি, বেরমজুর, হাতগাছি ইত্যাদি; এইসব অঞ্চলের প্রান্তিক চাষী ও সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তাঁরা কথা বলে বুঝতে পেরেছেন, তাঁদের যেসমস্ত ধানের জমি হাতড়ে নিয়ে মাছের ভেরি তৈরী করা হয়েছে, সেই জমি উদ্ধার হলেও সে জমি এখন এতই লোনা যে সেখানে অন্তত আগামী পাঁচ বছর আর ধান ফলানো যাবে না। সেই মাটি আবার ধান চাষের উপযোগী করতে হলে যে মাত্রায় সার এবং উৎসেচক পদার্থ প্রয়োজন হবে বা যতটা বর্ষার মিঠে জলের ওপর নির্ভর করতে হবে সেটা যেমন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ তেমনই তা সহজলভ্যও নয়। অন্যদিকে ভেরি চালাতে গেলে যে পরিমাণ পুঁজি নিবেশ করতে হবে তাও তাঁদের কাছে আকাশকুসুম কল্পনা।

জলবায়ু পরিবর্তনের কালে, এই ক্ষতি অপূরণীয়। এ শুধু দশের নয়, দেশের ক্ষতি। এই সুবাদে একটা কথা মনে করিয়ে দিতে হয় যে, এক কালে সরকার স্বয়ং সমুদ্র নিকটবর্তী নিম্নফলনশীল ধানি জমিকে মাছের ভেরিতে রুপান্তরিত করে চাষীদের আয় বৃদ্ধির শলাপরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই মতন বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পে যথেস্ট অনুদানও দেওয়া হয়। আজ সারা ভারতের তটীয় উপকুলে এই অতি লবনাক্ত ভেরির আগ্রাসন যেমন চাষের সর্বনাশ করেছে তেমনি বহু চাষীকেও ফতুর করে দিয়েছে। সেখানে না হয় মাছ, না ধান। শুধু বিষাক্ত জলের ওপর আরও বিষাক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ করে চাষী বসে থাকেন গালে হাত দিয়ে, লাভের আশায়। এই সুন্দরবনেই কিন্তু কিছু স্থানীয় নোনাসহনশীল ধান আছে যাদের ফলন তেমন ভালো নাহলেও, প্রাকৃতিক সহনশীলতা অত্যন্ত উচ্চমানের। শুধু তাই নয়, এই ধানগুলো যেমন সুস্বাদু তেমনই সুগন্ধি। খুব সাম্প্রতিক কালে, আম্ফুন ও ইয়াস পরবর্তি দুর্দিনে, 'সাউথ এশিয়ান ফোরাম ফর এনভায়রনমেন্ট' নামে একটি আন্তর্জাতিক নাগরিক সংগঠন এই রকমের চুয়ান্নটা ধানের বীজকে সংরক্ষিত করে একটা সামুদায়িক বীজ ভাণ্ডার তৈরি করেছে। এই বছর প্রায় চোদ্দ হেক্টেয়ার জমিতে প্রান্তিক চাষীরা সেই ধান চাষ করেছেন এবং সেই সুমিষ্ট সুগন্ধি চাল শহর কলকাতায় বিকচ্ছে প্রায় ১১০ থেকে ২২০ টাকা কেজি দরে। এই ধানের কয়েকটা হল;

মরিশাল, মেঘনা, মাছকন্যা, বিরহী, কলাবতি, খণ্ডগিরি, লালজোয়ারি, দোপানা, গেতু, খেজুরছড়ি, জামাইনাড়ু, কালাভাত, হরিনখুড়ি, নাগেশ্বরী, তুলসীমুকুল, নরসিংহ ইত্যাদি। এরই মধ্যে বেশ কিছু ধান রোপন করা যায় সন্দেশখালির শুন্য ভেরিতে। এই ধানের ফলন খুব ভাল ভাবেই সম্ভব এই ভেরির নোনা মাটিতে। তার জন্য বীজেরও অভাব হবে না, অনুকুল প্রযুক্তিও আছে এই সংগঠনের কাছে। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের জৈববৈচিত্র সংরক্ষণ সমিতি এই ধান উৎপাদনে এবং চাষীদের প্রশিক্ষনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন শুধু প্রয়োজন একটু উদ্যমের, একটু সহমর্মিতার, একটু উদ্যোগী হয়ে প্রান্তিক চাষীদের দিগদর্শনে সাহায্য করার। রাজনীতি হোল অনেক, এবার খিদের পেটে দুটো সত্যিকারের ভাতের ব্যবস্থা হোক।

## লোকসভা নির্বাচনে ব্রাত্য যারা

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

২০২৪ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহারগুলো বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় উঠে আসে; আজও কয়েকটি জরুরি বিষয় রাজনৈতিক দলগুলোর ভাবনায় ব্রাত্য থেকে গেছে। যেমন পরিবেশ সংকট, প্রবীণ নাগরিকদের জীবনযন্ত্রণা, পাট শিল্পের সংকট ও পরিযায়ী শ্রমিকদের দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি।

পরিবেশ সঙ্কট :

দলগুলোর ইস্তাহারে পরিবেশ ব্যাপারটার উল্লেখ থাকলেও সেইভাবে এর সমস্যাগুলোকে কিন্তু ধরা হয়নি। দেশ জুড়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যে খারাপ চেহারা, প্লাস্টিকের যে সমস্যা, দূষণ - আক্রান্ত নদীগুলির যে সমস্যা, তার সমাধান কবে কীভাবে হবে, সেসবের কোনও সীমারেখা এই ইস্তাহারে টানা হল না। যদিও কংগ্রেসের ইস্তাহারে অনেকগুলি বিষয়কে ধরার চেষ্টা রয়েছে। কংগ্রেসের ইস্তাহারটি যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁরা অন্তত পরিবেশের ব্যাপারে কিছুটা চিন্তাভাবনা করেছেন। কিন্তু নদী দূষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব, প্লাস্টিক সমস্যা, সমুদ্র সৈকতের দূষণ এইসব নিয়ে তাঁরা কতটা কার্যকরী ভূমিকা বা ব্যবস্থা নিতে পারবেন, সে বিষয়ে কোনও কথা নেই। পরিবেশের যে সমস্ত আইনকে ক্রমশ শিথিল করে ফেলা হচ্ছে, সে ব্যাপারে সিপিআইএম তাদের ইস্তাহারে উল্লেখের চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরিবেশ ছাড়পত্রের ব্যাপারেও যে সততা থাকা দরকার, সে সততা আছে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েই যায়।

রামসার-স্বীকৃত আমাদের পূর্ব-কলকাতার জলাভূমির দুরবস্থা সবাই জানেন। বিভিন্ন জায়গায় জলাভূমি শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। যত্রতত্র পুকুর বোজানো চলছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর মুখে কুলুপ। এমনকি এই নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বারবার প্লাস্টিক বা ফ্লেক্স ব্যবহার না করার অনুরোধ জানালেও একটি রাজনৈতিক দলও সে কথা রাখেনি। নির্বাচন মিটে গেলে যত্রতত্র পড়ে থাকা এই ফ্লেক্সগুলোর কী হাল হবে কেউ জানে না।

প্রবীণ নাগরিক অসহায় কিছু ম্লান মুখ :

প্রবীণ নাগরিকদের জীবন-যন্ত্রণার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, বর্তমানে কেন্দ্রে যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসীন, তারা ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনী ইস্তাহারে পরিষ্কার বলা ছিল যে, তারা কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে প্রবীণ নাগরিকদের পেনশন মাসে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু ১০ বছর কেটে গেলেও এ কথা রাখা হয়নি। বর্তমান সরকারের আগের সরকার যে ন্যূনতম পেনশন ১০০০ টাকা করে গেছিল, তার থেকে আর একটি পয়সাও বাড়েনি, অথচ এ নিয়ে বারবার প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলের

বিধায়ক ও সাংসদদের ভাতা ও মাইনে বাড়ছে। কিন্তু তারা কখনো ভেবে দেখেছেন কি একজন প্রবীণ নাগরিক কীভাবে মাত্র এক হাজার টাকায় প্রতি মাসে তার সংসারটা চালাতে পারেন? এ নিয়ে অনেক মামলাও হয়েছে। কিন্তু মামলা যাঁরা শুনবেন, তাঁদেরও এ বিষয়ে শোনার সময় নেই।

বৃদ্ধাবাস :

দেশে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বৃদ্ধাবাস নিয়ে যে আইন রয়েছে সেখানে বলা আছে প্রতিটি জেলায় একটি করে বৃদ্ধাবাস থাকবে। বৃদ্ধাবাসে কমপক্ষে ১৫০ জনের থাকার বন্দোবস্ত থাকবে। যে সমস্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কোথাও যাবার ক্ষমতা নেই, নিজেদের ভরণ-পোষণের ক্ষমতা পর্যন্ত নেই, তারা সেখানে আশ্রয় নিতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারের কিন্তু একটিও বৃদ্ধাবাস নেই। এমনকি বেসরকারি বৃদ্ধাবাসগুলোর জন্যও নিয়ম নীতি আজ পর্যন্ত স্থির করা হয়নি। এ নিয়ে উচ্চ আদালতে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। কিন্তু এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে মামলা শোনার সময় আমাদের মাননীয় বিচারকদের হয়নি। ফলে আইন থাকা সত্ত্বেও প্রবীণ নাগরিকদের আশ্রয় কেন কার্যকরী করা হল না, সে কথা আড়ালেই থেকে গেল।

ন্যায্য পাওনা ও কর্মসংস্থান :

হাজার হাজার শ্রমিক অবসরের পর তাদের ন্যায্য সামান্য গ্রাচুইটিটুকু পাচ্ছেন না। শ্রম দপ্তর বা প্রশাসন কারো এ ব্যাপারে কোন হেলদোল নেই। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে পাটকল রয়েছে, সেখানকার শ্রমিকদের সবার প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ন্যায্য গ্রাচুইটি পাওনা আছে। দিনের পর দিন উচ্চ আদালতে মামলা হচ্ছে, কিন্তু এই মামলার কোন ফয়সালা নেই। দু'একজন অতি সম্মানীয় বিচারক এসেছিলেন যাঁদের দেখে শ্রমিকরা আশায় বুক বেঁধেছিল, কিন্তু সমাধানের আগেই তাঁরা চলে গেলেন। সব রাজনৈতিক দলই বলছে কর্মসংস্থান করতে হবে। আমাদের রাজ্যে যে শিল্পের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান হয়, তা হল পাট শিল্প। এটি পরিবেশ বান্ধব শিল্প। হাওড়া, হুগলি, উত্তর চব্বিশ পরগনা ও কলকাতা সহ যে সমস্ত জায়গায় পাটকল রয়েছে, সেখানে যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিধায়ক বা সাংসদ হবার জন্য নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন, সেখানে তাঁরা পাট শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য কী একটি কথাও বলেছেন? বিগত ১০ বছরে কেন্দ্র ও রাজ্যে যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসীন, তাঁরা কি এই নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা ভাবনা করেছেন? আজ প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হল পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন। কিন্তু পুনরুজ্জীবনের বদলে একটার পর একটা পাট শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, উৎপাদন ক্রমশ কমে আসছে। শ্রমিকরা এই শিল্প থেকে ক্রমশ মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে, কারণ তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটির ন্যায্য পাওনা চুরি হয়ে যায়। সরকারি দফতরে অভিযোগ জানালেও কোন সুরাহা হয় না।

পরিযায়ী শ্রমিকের দুর্দশা :

আরেকটি অতি জরুরি বিষয় হল পরিযায়ী শ্রমিকদের দুঃখকষ্ট। কয়েকটি রাজনৈতিক দল পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা অল্পবিস্তর উচ্চারণ করেছে। কিন্তু এই উচ্চারণের মধ্যে কোন অনুশোচনা নেই। দুই কোটি পরিযায়ী শ্রমিক রাস্তার ধারে ও রেল লাইনের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মারা গেছে। কিন্তু রাষ্ট্র নির্বিকার। এটা নিয়েও একটা আইন আছে -- আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক আইন। কিন্তু সেটা কেউই কার্যকারী করেনি।

কংগ্রেস, বিজেপি এবং কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘদিন কোন না কোন রাজ্যের ক্ষমতায় ছিল বা আছে। এরা কি কেউ এটা নিয়ে ভেবেছে! একমাত্র কেরালায় কিছুটা কাজ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৪ বছর ধরে কয়েকটি সমমনা রাজনৈতিক দল একসাথে ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু তারাও এই

আইনটিকে কার্যকর করে যায়নি। এ নিয়েও উচ্চ আদালতে মামলা হয়েছে। তথ্যের অধিকার আইনের শ্রম দপ্তর জানাচ্ছে যে, তাদের কাছেও পরিযায়ী শ্রমিকদের সেরকম কোন নথিপত্র নেই। কিছুদিন আগে আমাদের রাজ্যের এক পরিযায়ী শ্রমিক বেঙ্গালুরুতে কাজের জন্য গেল, কিন্তু সে আর ফিরল না। এমনকি এও শোনা গেছে যে, বহু পরিযায়ী শ্রমিকের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাইরে চালান দেওয়া হয়। পরিযায়ী শ্রমিকরা আজ এইরকম এক চরম দুর্দশার মুখে দাঁড়িয়ে।

অতঃকিম্

আবার একটি নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইস্তাহার প্রকাশিত। জুন মাসে ফলাফল ঘোষিত হবে। কোন না কোন রাজনৈতিক দল কেন্দ্র সরকারের ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু এসব সমস্যার নিরসন কে করবে? রবীন্দ্রনাথকে এ ক্ষেত্রে স্মরণ করতে হয়, মানুষের উপর আস্থা হারানো পাপ। এই মানুষকে নিয়েই আগামী দিনে আমাদের সমস্যা সমাধানের পথে এগোতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে এ বিষয়ে ভাবাতেই হবে।

## গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই

শুভাশিস মজুমদার

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) সাংবিধানিক বৈধতা বহাল রেখে পৃথক কিন্তু একই সময়ে রায় লিখে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস এবং অন্যদের দায়ের করা পিআইএলগুলি খারিজ করে দিয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল, সুপ্রিম কোর্ট ইভিএমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে সমর্থন করে বলেছে যে ইভিএম কারচুপির (টেম্পারিংয়ের) বিরুদ্ধে অন্তর্নির্মিত সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। তবে একই সঙ্গে 'নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও শক্তিশালী করতে' নির্বাচন কমিশনকে সুপ্রিম কোর্ট বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের ওই বেঞ্চ কাগজের ব্যালটে ভোটদান প্রক্রিয়ার পুনঃপ্রবর্তন বা ভিভি প্যাট স্লিপের সম্পূর্ণ গণনা নাকচ করেছে। যুক্তি দিয়েছে, মানুষের গণনায় ত্রুটি এবং কারচুপির সম্ভাবনা থেকে যায়। আবেদনে কাগজের ব্যালটে ভোটদান প্রথা ফেরত চাওয়া হয়েছিল। অথবা, প্রিন্ট করা ভোটার-ভেরিফাইয়েবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপ্যাট) স্লিপগুলি যাতে ভোটারদের দেখার জন্য দেওয়া হয়, যেগুলিকে ভোটাররা দেখে নেওয়ার পর গণনার জন্য ব্যালট বাক্সে রাখা হবে; এবং/অথবা কন্ট্রোল ইউনিট দ্বারা ইলেকট্রনিক গণনা ছাড়াও প্রতিটি ভিভি প্যাট স্লিপ গণনা করার নির্দেশ দিতে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ভিভি প্যাট স্লিপ কাউন্টের সংখ্যা বাড়াতে আগ্রহী নয়। বিচারপতি খান্না তাঁর রায়ে বলেন, 'এটি গণনার সময় বাড়বে এবং ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব ঘটাবে। প্রয়োজনীয় জনবল দ্বিগুণ করতে হবে'। বিচারপতি দত্তর পর্যবেক্ষণ 'নির্বাচকদের দেওয়া ভোটের সাথে ৫ শতাংশ ভিভি প্যাট স্লিপ গণনা করার ব্যবস্থা রয়েছে, আজ পর্যন্ত কোনও অমিল হয়নি।' তবে একইসঙ্গে ওই রায়ে সুপ্রিমকোর্ট কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশনকে।

প্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে, প্রতীক সম্বলিত ইউনিটগুলিতে একবার প্রতীক আপলোড করার পরে সেই ইউনিটগুলিকে সিল করে দিতে হবে। ফল ঘোষণার পর ৪৫ দিনে সেগুলিকে সংরক্ষিত রাখতে হবে। ইউনিটগুলির সিলে প্রার্থীদের সই থাকতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দ্বিতীয়ত, ভোটের ফলাফলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে থাকা প্রার্থীর মনে কোন সংশয় থাকলে তিনি ফল

ঘোষণার সাত দিনের মধ্যে পুনর্মূল্যায়নের আবেদন জানাতে পারবেন। এর জন্য ওই প্রার্থীকে নির্দিষ্ট অংকের অর্থ জমা দিতে হবে আবেদনের সঙ্গে। সেক্ষেত্রে মাইক্রো কন্ট্রোলারে কোন কারচুপি হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দল। তাঁদের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে জেলা নির্বাচনী অফিসার জানিয়ে দেবেন ফলাফলে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়েছে কিনা। যদি ইভিএমে কারচুপির প্রমাণ পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর অর্থ ফেরত দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। অন্যথায় ওই টাকা প্রার্থী ফেরত পাবেন না। উল্লেখ্য, এই সুযোগ আগে প্রার্থীদের ছিল না।

এছাড়া, বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে আরও দুটি বিষয় ইভিএম ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। প্রথমটি ব্যালট ইউনিটে প্রতিটি প্রার্থীর প্রতীকের পাশে বারকোড রাখা সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখা। আবেদনকারীদের পক্ষে ওই আবেদন জানান আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে। দ্বিতীয়ত, ভিভি প্যাট যন্ত্রে জমা হওয়া স্লিপ কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রুত গণনা করা সম্ভব কিনা তাও খতিয়ে দেখতে কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

নির্বাচন প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত এই সংস্কারের পক্ষে কোর্টের নির্দেশগুলি অবশ্যই আবেদনের সুফল হিসেবে দেখা যেতে পারে। যদিও গদি মিডিয়া এই রায়কে কংগ্রেস এবং বিরোধীদের পরাজয় হিসেবে দেখাতে চাইছে। মোদী এই রায়কে বিরোধীদের গালে 'বড় মাপের থাপ্পড়' বলে মন্তব্য করেন। জবাবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কংগ্রেস কখনই ইভিএম ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। তবে ভোটের পরে আরো বেশি করে ইভিএম ব্যবস্থায় প্রাপ্ত ভোট ও ভিভিপ্যাট স্লিপ মিলিয়ে দেখার সংখ্যা যাতে বাড়ে সেই দাবিতে কংগ্রেস সরব হয়েছে। তাছাড়া ওই পিটিশনে কংগ্রেস বা অন্য কোন বিরোধীদল পার্টি ছিল না।

প্রধানমন্ত্রীর 'থাপ্পড়' মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ পাল্টা আক্রমণ করে বলেছেন, 'দিন কয়েক আগেই নির্বাচনী বন্ডকে কেবল বেআইনি ঘোষণা করা নয় অসংবিধানিক বলে মন্তব্য করে মোদীর গালে কড়া থাপ্পড় মেরেছিল সুপ্রিম কোর্ট।' তিনি বলেন, 'যেভাবে চার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দল আট হাজার দুশো কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর উচিত দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়া। ওই চারটি পদ্ধতি হল, অনুদান দিয়ে প্রকল্প পাওয়া, ঘুষ দিয়ে সরকারি বরাত নিশ্চিত করা, তোলাবাজি ও ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা।'

ইভিএম ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে ২৭ এপ্রিল দ্য ওয়ার নিউজ পোর্টালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা -কে পোক্ত করা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এই প্রবন্ধে। প্রশ্ন করা হয়েছে, ভারতের নির্বাচন কমিশন-এর কাছে কি এমন কোনো অভিজ্ঞতামূলক তথ্য আছে যা দিয়ে প্রমাণ করতে পারে যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় প্রকৃতপক্ষে ইভিএমকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে?

জানা গেছে, আদালত আবেদনকারীদের জিজ্ঞাসা করেছে বড় সংখ্যক ভারতীয় ইভিএম বিশ্বাস করে না, এই দাবি করার তথ্যের উৎস কি। এটাও জানা গেছে যে আদালত সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ডেভেলপিং সোসাইটিজ (সিএসডিএস) দ্বারা করা সার্ভেটিকে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে খারিজ করেছে।

ওই প্রবন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছে, আদালত ভারতের নির্বাচন কমিশনকে কি জিজ্ঞাসা করেছে

যে, ভোটের দিন তাদের কাছে যদি কোনো অনুসন্ধানমূলক তথ্য থাকে, তাহলে তার মধ্যে এমন ভোটার রয়েছে কিনা যারা ভোটার (ভিভিপ্যাট) স্লিপে সঠিক প্রতীক দেখেছে এবং বাক্সে স্লিপ ড্রপ হতে দেখেছে। ভিভিপ্যাট স্লিপে সঠিক চিহ্ন দেখেছে কিন্তু বাক্সে স্লিপ ড্রপ হতে দেখতে পায়নি। ভিভিপ্যাট স্লিপে ভুল চিহ্ন দেখেছে কিন্তু বাক্সে স্লিপ ড্রপ হতে দেখেছে। ভিভিপ্যাট স্লিপে সঠিক চিহ্নও দেখেনি বা বক্সে স্লিপ ড্রপ হতেও দেখেনি।

যদি নির্বাচন কমিশন-এর কাছে এমন অনুসন্ধানমূলক তথ্য না থাকে, তাহলে কিসের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন দাবি করে যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় ইভিএমে বিশ্বাস করে?

## অধিকার, গণতন্ত্র আর সংবিধানের প্রশ্নেই আসামে নির্বাচন

পারিজাত নন্দ ঘোষ

দেশের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে আসামে নির্বাচনের প্রচার চলছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন যে আসামের ১৪ টি আসনের ১৩ টিতেই তাঁরা জয়লাভ করবেন। এই দাবির সত্যতা কতটা?

আসামে তিনটি পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে যোরহাট, ডিব্রুগড়, কাজিরঙা, লক্ষিমপুর, শণিতপুর লোকসভা আসন। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অসমীয়াভাষী ও চা শ্রমিকদের ভোটের আধিপত্য এখানে। এই অংশে বিজেপির মূল ভোট। এছাড়াও উজানের কংগ্রেস নেতা রানা গোস্বামী, বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মী, সুশান্ত বড়গোহাঁইদের বিজেপি-তে সামিল করেছে। এরপরেও যে ইন্ডিয়া জোট এখানে টেক্কা দিয়েছে সেটি হচ্ছে উজানের অন্যতম আসন যোরহাট লোকসভা কেন্দ্র কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গৌরব প্রাক্তন নেতা তথা বর্তমান বিজেপি সাংসদ তপন গগৈকে প্রার্থী করা হয়েছে। তপন গগৈ সংসদে মৌন। কিন্তু গৌরব উত্তরপূর্বাঞ্চলের সরব সাংসদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে মণিপুরে যখন হিংসার আগুন জ্বলছিল তখন প্রধানমন্ত্রীর মৌনতার বিষয়কে কেন্দ্র করে গৌরব গগৈ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। সংসদে সেদিন গৌরবের বক্তব্য চারদিকে ছড়িয়ে পরে। কাউকে ব্যাক্তিগত আক্রমণ না করে যুক্তি সহকারে ও প্রাঞ্জল ভাষায় গৌরব গগৈ সেদিন যে ভাবে বক্তব্য রেখেছেন, তা আসামের মানুষের মন জয় করেছে। গৌরবের ব্যক্তিত্ব, স্বচ্ছ রাজনীতি, সংসদে তার ভূমিকা তাঁকে আসামের মানুষ ভবিষ্যতের আসামের মুখ হিসাবে বলা শুরু করেছে। এই প্রেক্ষাপটে গৌরব গগৈ যোরহাটে প্রার্থী হওয়ার যোরহাটের সমান্তরাল ভাবে ডিব্রুগড় ও উজানের অন্যান্য প্রান্তেও প্রভাব পরেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আসনগুলো হল নগাঁও, মঙলদৈ-ওদালগুড়ী, ডিফু এবং বরাক উপত্যকার দুই লোকসভা আসন, করিমগঞ্জ ও শিলচর। নগাঁও আসনে ২০১৯-এ কংগ্রেসের প্রদুৎ বরদলৈ জয়ী হয়েছিলেন। এবারও ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী প্রদ্যুৎ। বিজেপির প্রার্থী সুরেশ শর্মা কিছুদিন আগেও কংগ্রেসে ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এ আই ইউ ডি এফ -ও। তবে এই আসনে পাল্লা ভারি ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী প্রদুৎ বরদলৈয়েরই। প্রথম পর্যায়ে যোরহাট লোকসভা যেমন আকর্ষণীয় ছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ে আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু করিমগঞ্জ। আগে এই আসন সংরক্ষিত ছিল এসসি-র জন্য, আসামে ডিলিমিটেশনের পর এবার এটা মুক্ত হয়। ২০১৯-এ বিজেপি জয়ী হয়েছিল এবং সেই সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাকেই প্রার্থী করেছে বিজেপি। ২০১৪-তে জয়ী হয়েছিল এআইইউএফের প্রার্থী, এবারও এইআইইউডিএফের প্রার্থী রয়েছেন।

২০১৪-র নির্বাচিত সাংসদ রাধেশ্যাম বিশ্বাস কিছুদিন আগেই দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন এবং এবার তিনি শিলচর থেকে তৃণমূল প্রার্থী। ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী এবছরই কংগ্রেসে যোগদান করা হাফিজ রসিদ চৌধুরী। হাফিজ রসিদ চৌধুরী গুয়াহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী এবং আসামের সমাজ জীবনে অন্যতম ব্যাক্তিত্ব। তাঁকে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী করাতে পিছিয়ে পড়েছে বিজেপি ও এআইইউডিএফ। তাঁর হয়ে বহু গণতান্ত্রিক মানুষ, আইনজীবী, শিক্ষক, সামাজিক কর্মী প্রচারে নেমেছেন, বহু অরাজনৈতিক সংগঠন ময়দানে নেমেছেন।

৭ মে হবে রাজ্যের তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ের ভোট। এই পর্যায়ের ভোট হচ্ছে গুয়াহাটি, ধুবড়ী, কোকরাঝার ও বড়পেটা। ধুবড়ীতে এনডিএ শরিক কোনো ফেক্টর নয় বরং এখানে মূল লড়াই কংগ্রেস ও এআইইউডিএফের মধ্যে। গুয়াহাটিতে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী বনাম বিজেপির প্রার্থী। কোকরাঝারে ২০১৪ এবং ২০১৯-এর নির্দল তথা বড়ো সমর্থিত প্রাক্তন সাংসদের এবার নমিনেশন বাতিল হওয়ায় বিজেপি-ইউপিপিএল বিরোধী ভোট কোথায় যাবে তা এখনো স্পষ্ট না হলেও বিজেপি তথা এনডিএ-র শরীক দলের বিরুদ্ধে প্রচন্ড জনমত রয়েছে, বিরোধী ভোট বিভাজন না হলে জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। বড়পেটায় সিপিএমের প্রার্থী মনোরঞ্জন তালুকদারের জয় প্রায় নিশ্চিত ছিল, যদি তিনি ইন্ডিয়া জোটের একক প্রার্থী হতেন। কেননা এনডিএ-র পক্ষে বিজেপির সমর্থিত অগপ প্রার্থী আসাম বিধানসভার প্রবীণ বিধায়ক। সংসদে প্রার্থী হিসাবে তাঁকে অযোগ্য বলেই বিবেচনা করছেন বড়পেটায় সচেতন মহল। তবে এখানে কংগ্রেস এবং সিপিএম প্রার্থী থাকায় বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যান্য বারের চেয়ে এবারের নির্বাচন অনেকটা ব্যাতিক্রমী। খুব বড় সভা বা প্রচার নেই। ক্ষমতাসীন দলের অর্থ ও সাংগঠনিক ভিত্তি থাকায় তারা প্রচারে নামলেও তেমন কোনো উৎসাহ নেই। মূলত গ্রামের মহিলা ভোটারকে 'অরুণোদয়' হিতাধীকারীর নাম নিয়ে অথবা আত্মসহায়ক গোটের সভা বলে রাজনৈতিক সভা চালিয়ে দিচ্ছে। বিরোধীদেরও তেমন বড় সভা করতে বা পোস্টার লাগাতে দেখা যায়নি। সরকারের প্রতি একটা ক্ষোভ, একটা রাজনৈতিক অনীহা মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি, হিন্দু-মুসলমান, ভাষা-জাতির নামে রাজনীতি, বেকারত্ব, ইলেকটোরাল বন্ড, কৃষকদের তীব্র আন্দোলন, অশান্ত মণিপুর, দেশের গৌরব কুস্তিবীরদের ইস্যু যেমন উঠে এসেছে, তেমনি আবার সংবিধান আর গণতন্ত্রের প্রশ্নটাও এবার সচেতন ব্যাক্তিদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। জুমলাবাজি, মিথ্যা প্রচার, মিডিয়া থেকে শুরু করে সব এজেন্সিকে ব্যবহার করা, কবি-সাংবাদিক, সামাজিক কর্মী সহ বিরোধীদের জেলে পুড়ে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দূর্নীতিগ্রস্থ নেতা-কর্মীকে নিজেদের দলে সামিল করে রাতারাতি তাদেরকে সাধু সাজানোর যে রাজনীতি এসব দেখে মানুষের মধ্যে বিরক্তির জন্মেছে। এছাড়াও আসামে রয়েছে অঞ্চলভিত্তিক নিজস্ব ইস্যু; ২৭ লাখেরও বেশি মানুষের আধার কার্ড কড়ে নেওয়ার প্রশ্ন। এনআরসি নবায়নের বিরোধের সময় যে বায়োমেট্রিকস নেওয়া হয়েছিল, তারজন্য সেই লোকগুলোর আধারকার্ড হয়নি। আধারকার্ড না থাকায় কেউ ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে পারছে না, কেউ সরকারি আবাস, রেশন ও অন্যান্য সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আধার ও নাগরিকত্বের প্রশ্নে গত ১৭ মার্চ শিলচরে ১৪ টি সংগঠনের যে যৌথ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে স্লোগান ওঠে, 'নো আধার, নো সিটেজেনসিপ নো ভোট টু

বিজেপি।' উজান আসামে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ও চা বাগানের শ্রমিকদের বিজেপির সরকারের দ্বারা বঞ্চনার বিষয়টি বিরোধীদের প্রচারে আসে। এছাড়া বরাক ও ভাটি আসামে যোগ হয় এনআরসি, ডিটেনশন, ডি-ভোটার, ক্যাম্প, নাগরিকত্ব, আধার বন্ধ হওয়া নগাঁও ও কাছার কাগজ কল, সারা আসাম জুড়ে অমানবিক উচ্ছেদ, খিলঞ্জীয়া-অখিলঞ্জীয়ার শ্রেণী বিভাজন। আসাম জুড়েই প্রচারে আসে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতি করণের নামে কালক্ষেপ, বন্যার সমস্যা, জমির পাট্টা, হাজার হাজার সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া, নিয়োগ কেলেঙ্কারি ও বিজেপি সরকার কর্তৃক আসামকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা, কৃষক-শ্রমিকের প্রশ্ন, এনপিআরের প্রশ্ন।

অনিয়ন্ত্রীত হারে মূল্য বৃদ্ধি, মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর জমি কেলেংকারী ও বিজেপির ও তাদের মিত্রগোষ্ঠী ইউপিপিএল ও অসম গণ পরিষদের দুর্নীতির প্রসঙ্গও প্রচারিত হচ্ছে। সিএএ-র নামে আর কাউকে ললিপপ দিতে পারেনি বিজেপি। কেননা আইন তৈরি হতেই মোদি-অমিত শাহদের চাল বুঝে গিয়েছে মানুষ। যারা অন্ধভক্ত ছিল তাদেরও মোহ কেটেছে! অন্তত বিজেপির নেতারা যেভাবে হিন্দু বাঙালিকে টুপি পরানোর চেষ্টা করত তা আর কাজে আসছেনা। শাসক গোষ্ঠীর স্বভাব সিদ্ধ ভাবে আগ্রাসী আর ঘৃণার রাজনীতি ছাড়া যে বিষয়টিকে তারা হাতিয়ার করেছে সেটা হচ্ছে হিতাধিকারীর রাজনীতি। বিশেষ করে 'অরুণোদয়'-কে কেন্দ্র করে সাধারণ মহিলাদের জড়ো করে সভায় লোক দেখানোর চেষ্টা। বহু ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব এবং বিরোধীদের দূর্বল সাংগঠনের সুযোগে এই হিতাধিকারী রাজনীতি ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিশেষ করে মহিলা ভোটারকে আসামের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের দিকে টানতে বেশ কিছুটা সক্ষম হয়েছে।

## দ্বিতীয় দফার ভোটের পরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের পর বিজেপি বুঝতে পেরেছে তারা দুই দফার ভোটেই হারছে। এই জন্যই নরেন্দ্র মোদী পরবর্তী পর্যায়ে সরাসরি উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু করেছেন। তাঁর আচরণ অস্বাভাবিক। মোদী ভুলে গিয়েছেন যে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি যে ভাষায় সংখ্যালঘুদের বিশেষত মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছেন, তা ফ্যাসিস্ত নায়ক হিটলারের ইহুদি বিদ্বেষের সঙ্গে তুলনীয়। নির্বাচন কমিশন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে।

বিজেপি নির্বাচনের আগেও ৪০০ আসন পার করার স্লোগান তুলেছিল, দ্বিতীয় দফার ভোটের পর নিজেরাই পরাজয় মেনে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আকৃষ্ট করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন, মানুষ তাঁর জাল প্রতিশ্রুতিতে আর ভুলতে রাজি নয় এবং মিথ্যা আখ্যানকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতারা বলতেন মোদীর নামে একটা কুকুরও জিতবে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এত খারাপ হয়েছে যে মোদীর অনেক মন্ত্রীই হয়তো নিজেদের আমানত বাঁচাতে পারছেন না। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ১৩টি রাজ্যের ৮৮টি আসনে ভোট হয়েছে। রাজনৈতিক পণ্ডিতদের মতে, এই পর্বে বিজেপির পক্ষে ২৮টি আসনও পাওয়া কঠিন।

অরুণ গোভিল, হেমা মালিনী, রাজীব চন্দ্রশেখর, ওম বিড়লা এবং তেজস্বী সূর্যের মতো বিজেপি নেতারা নির্বাচনের আগে লম্বা দাবি করছিলেন; ফলাফল ঘোষণার আগেই পরাজয় মেনে নিয়েছেন।

নির্বাচনের প্রথম ধাপে, ১৯ এপ্রিল ১০২টি আসনের জন্য ভোট দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ২০১৯ সালে ৫১টি আসন বিজেপি ' র জোট জিতেছিল। কিন্তু এবার বিজেপির পক্ষে ৩০টি আসনও জয় করা কঠিন হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রথম দফার ভোটে মাত্র ৬২ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন, যেখানে ২০১৯ সালে ভোটের হার ছিল ৬৬। যদিও ১১ দিন পর কমিশন বলছে এবারও নাকি ৬৬ ভোট পড়েছে। কমিশনের কাজের পদ্ধতি অদ্ভুত। হঠাৎ পোলিং পার্সেন্টেজ বেড়ে যাওয়া রহস্য জনক। বিজেপির ব্যয়বহুল প্রচার এবং তার ল্যাপডগ মিডিয়া থাকা সত্ত্বেও, কম ভোটার উপস্থিতি বিজেপির জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজ্যভিত্তিক পরিস্থিতি অনেকটা এরকম

আসাম (৫ টি আসন) ইন্ডিয়া জোট ৩টি আসন জিততে পারে, যেখানে বিজেপি মাত্র ২ টি আসন জিততে পারে।

ছত্তিশগড় (৩টি আসন) রাজনন্দগাঁও, মহাসমুন্দ, কাঙ্কের, তিনটি আসনই কংগ্রেসের পক্ষে যেতে পারে।

জম্মু ও কাশ্মীর (১ আসন) বিজেপি জম্মুতে অপমানজনক পরাজয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। এই রাজ্যে তারা আর কোনও আসনে লড়ছে না।

কর্ণাটক (১৪টি আসন) কংগ্রেস ১০টি আসন পেতে পারে।

কেরালা ( ২০ টি আসন) গত নির্বাচনে, কংগ্রেস জোট ২০ টি আসনের মধ্যে ১৯ টিতে জিতেছিল, এবারও তাদের আশা এখানে একই রকম ফলাফল হতে পারে। সেখানে ইউডিএফ জোট কোনও আসনে হারলে, তাতে জিতবে বামপন্থীরা। তারাও যথেষ্ট শক্তিশালী। বিজেপি এই রাজ্যে কোনও আসনেই জিতবে না।

মধ্যপ্রদেশ (৬টি আসন) কংগ্রেস ৩ টি আসন এবং বিজেপি ৩টি আসন জিততে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

মহারাষ্ট্র (৮টি আসন) ভারত জোট ৬ টি আসন জিতবে বলে আশা করা হচ্ছে যেখানে এনডিএ মাত্র ২টি আসন জিতবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজস্থান (১৩টি আসন) কংগ্রেস ৯টি আসন পাবে বলে আশা করা হচ্ছেষ বিজেপি পেতে পারে মাত্র ৪টি আসন।

ত্রিপুরা (১ টি আসন) ত্রিপুরা পূর্ব থেকে বিজেপি প্রার্থী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রবল হামলাবাজি করা সত্ত্বেও তীব্র লড়াইয়ের সামনে পড়েছেন।

উত্তর প্রদেশ (৮টি আসন) ইন্ডিয়া জোট এখানে ৫টি আসন জিতবে বলে আশা করা হচ্ছে, যেখানে বিজেপি ৩টি আসন পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ (৩টি আসন) এখানে দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট ৩টি আসনেই বিজেপি শক্ত লড়াইয়ের মুখে পড়েছে।

বিজেপির পরাজয়ের সম্ভাব্য কারণ

নির্বাচনী বন্ড থেকে মঙ্গলসূত্র পর্যন্ত, মানুষ এখন মোদী এবং বিজেপির বাস্তবতা জানে। এবার জনগণ নির্ধারকভাবে ভোট দিয়েছে বিজেপিকে পরাজিত করতে।

রাজস্থান এবং ইউপিতে রাজপুতরা বিজেপিকে পাঠ শেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তার প্রভাব নির্বাচনের প্রথম দুই পর্বে দেখা গেছে। এই কারণেই দ্বিতীয় দফাতেও এই দুই রাজ্যে বিজেপির বড় ক্ষতি হয়েছে।

ইউপি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং মহারাষ্ট্রে দলিত ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বেশ বেশি। সংবিধান ও রিজার্ভেশন বাঁচানোর লক্ষ্যে বিশাল অংশের মানুষ ইন্ডিয়া (ভারত) জোটের পক্ষে অপ্রতিরোধ্যভাবে ভোট দিয়েছে।

মণিপুরে সহিংসতা এবং প্রধানমন্ত্রীর সামান্য সহানুভূতির অভাবের কারণে, উত্তর-পূর্বের মানুষ বিজেপির উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। আসাম-মিজোরাম বিবাদের জন্য বিজেপিকে ঠিকই দায়ী করা হচ্ছে, আসামের মানুষও বিজেপিকে ধাক্কা দেবে।

হিন্দু-মুসলিম বিভেদমূলক আখ্যানের পরিবর্তে, ভোটাররা কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া (ভারত) জোটকে ভোট দিচ্ছে। বেকারত্ব, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, নির্লজ্জ দুর্নীতি এবং সম্পূর্ণ একনায়কতন্ত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভোটাররা বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছে।

ভোটের দুই ধাপের পর, এখন এটা নিশ্চিত যে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের চেষ্টা মোদী যতই করুন না কেন, ভারতের বুদ্ধিমান ও সচেতন ভোটাররা বিভ্রান্ত হবেন না। সারা দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছে যে মোদী এবং বিজেপি গত ১০ বছরে শুধুমাত্র মিথ্যা আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই দেয়নি।

## ভোট কাকে দেবেন, কেন দেবেন

এবারের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ত কর্পোরেট পুঁজিপতিদের দাস, সংবিধান বিরোধী বিজেপি এবং চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করুন। সর্বত্র কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলির প্রার্থীদের জয়ী করুন।

এই নির্বাচন দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনে কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলি সমঝোতা করে একসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আমাদের দেশ এক গভীর সংকটের মধ্যে। কর্পোরেট পুঁজির আর্থিক সহায়তায় ও বৃহৎ মিডিয়ার প্রোপাগান্ডার সহায়তায় সাম্প্রদায়িক শক্তি ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা কবজা করে আছে। শাসক দল ও শক্তির সাহায্যে বর্তমানে দেশের সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর, রেল, খনিজ তেলের ব্যবসা, কয়লা খনি, ইস্পাত, টেলিকম ব্যবস্থা, জীবনবীমা, ব্যাঙ্কসহ প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা দ্রুতগতিতে কয়েকজন কর্পোরেট মিত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

গত পঞ্চাশ বছরে দেশের বেকার সমস্যা সর্বাধিক। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরে ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলিতে ৩০ লক্ষ পদ শূণ্য। মোদী বলেছিলেন প্রতি বছর দুই কোটি কর্ম সংস্থান করবেন। দেশের ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যা নিয়ে মোদী ও তার দল নির্বাচনী ইশতেহারে একটা শব্দ উচ্চারণ করেননি। রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস কিন্তু তাঁদের ন্যায় গ্যারান্টিতে ঘোষণা করেছেন, ক্ষমতায় এসেই রাজ্যে ও কেন্দ্রে ৩০ লক্ষ্য শূন্যপদ পূরণ করবেন।

নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ঘোষণা করেছিলেন ক্ষমতায় এসে সুইস ব্যাংক থেকে কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা জমা করবেন। 'নোটবন্দী'-তে কত কালো টাকা উদ্ধার হয়েছে তার কোনও তথ্য নেই। রিজার্ভ ব্যাংক স্বীকার করেছে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটের শতকরা ৯৯ ভাগ অর্থ ফিরে এসেছে। কালো টাকা উদ্ধার নয়, আসলে তা সাদা করার জন্যই এই 'নোটবন্দি' করা হয়েছিল।

মোদী ত্রুটিপূর্ণ জিএসটি চালু করায় প্রতিটি পণ্যের দাম বেড়েছে। রাজ্যগুলিকে জিএসটি-র প্রাপ্য করের ভাগও নিয়মিত ভাবে দেওয়া হয় না। পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম কি হয়েছে সকলে জানেন। চাল, ডাল, তেল, নুন, আটা, ওষুধপত্র সহ প্রতিটি দ্রব্যের আকাশ ছোঁয়া দাম। বেকার সমস্যা ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কোনও শব্দ উচ্চারণ না করলেও, মোদী যথারীতি তাঁর বক্তৃতায় ধর্মীয় বিভাজন ঘটানোর জন্য মুসলিম লীগ, জিন্না, মুসলমান, পাকিস্তান এইসব নিয়ে আবোল তাবোল কথা বলে চলেছেন। দেশের যে বিশাল সংখ্যক মানুষ আমিষ খান তাঁদের তিনি আক্রমণ করছেন। গত ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের পর পরাজয় নিশ্চিত বুঝে মোদী প্রচার করেছেন, কংগ্রেস নাকি ক্ষমতায় এলে অর্থনৈতিক সমীক্ষা করে সব হিন্দু মহিলাদের সোনা রুপা সব নিয়ে মুসলমানদের দিয়ে

দেবে। একজন প্রধানমন্ত্রী তাঁর পদের অমর্যাদা করে কত নিচে নামতে পারেন এই ধরনের কথাবার্তা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মোদীর প্রতিশ্রুতি ছিল কৃষকের আয় দ্বিগুণ হবে। আসল উদ্দেশ্য ফসলের পাইকারি ব্যবসাটি আদানিদের হাতে তুলে দেওয়া। মোদী তাঁর নির্বাচনী ভাষণে ভুলেও বেকার সমস্যা, ওষুধপত্র; খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের তীব্র মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিয়ে একটা কথাও বলেন না। পরিবর্তে তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার চালিয়ে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে এরা ধ্বংস করতে চায়। মানুষের নিজের পছন্দ মতন খাদ্যাভাস, পোষাক পরার অধিকারে তারা হস্তক্ষেপ করে। ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচার করে চরম অশান্তি সৃষ্টি করা হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মণিপুর।

মোদীর রাজত্বে অন্তত ৩২ জন পুঁজিপতি যার মধ্যে অন্তত ২৫ জন গুজরাটের বাসিন্দা, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের অন্তত এক লক্ষ কোটি টাকা মেরে দিয়ে বিদেশে পালিয়ে গিয়েছেন। এদের নাম নীরব মোদী, মেহুল চক্সি, বিজয় মালিয়া, ললিত মোদী, যতীন মেহতা প্রমুখ। এদের মধ্যে একজনও মুসলমান নেই। এদের গ্রেপ্তার করার কোনও চেষ্টা মোদী সরকার করেছেন কি? অর্থনৈতিক অপরাধীদের একজনকেও দেশে ফেরৎ আনা গিয়েছে?

দুর্নীতিতে বিজেপি সরকারের সর্বশেষ কৃতিত্ব 'ইলেকটোরাল বন্ড'। এর মাধ্যমে বিশ্বের সবথেকে বড় তোলাবাজ হিসাবে রেকর্ড করেছে বিজেপি সরকার। নিম্নমানের ওষুধ তৈরীর জন্য যেসব কোম্পানির কারখানায় কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর অভিযান করেছিল তারা এই বন্ড কিনে বিজেপির তহবিলে জমা দেওয়ার পর তাদের ছাড়পত্র দেওয়া হল। একইসঙ্গে সেইসব নিম্নমানের ওষুধের দাম বাড়ানোর অধিকারও তাদের দেওয়া হয়। মিডিয়াগুলিতে মোদী সরকারের দুর্নীতির সংবাদ তুলে ধরা হয় না। যেমন রাফায়েল যুদ্ধ বিমান ক্রয়ের দুর্নীতি নিয়েও এই 'গোদি মিডিয়া' চুপ ছিল। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ ধ্বংস প্রায়।

মোদি স্লোগান দেন 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও।' কুস্তিতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে পদকজয়ী সাক্ষী মালিক, আনসু মালিক, বিনেশ ফোগত প্রভৃতি বহু মহিলা কুস্তিগীর, কুস্তি অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ স্বরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে নারী নিগ্রহের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলে দিল্লির জন্তর মন্তরে রাস্তায় ধর্ণা দেন তখন প্রধানমন্ত্রীর মনে পড়ে না এরাও কারও বেটি। সন্দেশখালী নিয়ে তিনি কুমীরের অশ্রু বিসর্জন করছেন, কিন্তু মণিপুর নিয়ে তিনি নিশ্চুপ। জাতীয় ক্রাইম বুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী মহিলাদের বিরুদ্ধে সব চাইতে বেশি অপরাধের রেকর্ড উত্তরপ্রদেশে। অথচ মধ্যপ্রদেশ, গুজরাটে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে সরকার চালাচ্ছে বিজেপি। এই বিজেপিকে নির্বাচিত করা মানে দেশকে একশো বছর পেছিয়ে দেওয়া।

আমাদের প্রিয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নিয়েও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, সবেতেই করুণ অবস্থা। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশের ব্যাপক অবনতি হয়েছে। ২০১১ সালে কংগ্রেসের সহায়তায় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সেই কংগ্রেস ও বিরোধী দলগুলির ওপর ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয়। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস উত্তর দিনাজপুর, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ নির্বাচনে জয়লাভ করে। বামপন্থীরা জয়লাভ করে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে। কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিরোধীদের জেতা সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম

পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদ দলত্যাগ করিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস দখল করে নেয়। এরপর ২০১৮ ও ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন কেমন ভাবে হয়েছে তা রাজ্যের মানুষ জানেন।

সম্প্রতি সন্দেশখালীর ঘটনায় দুর্নীতি আরো একবার সামনে এসেছে। রাজ্যে বিরাট সংখ্যক পঞ্চায়েত সদস্য নানা প্রকার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ও তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ ভিন রাজ্যে যাচ্ছে কাজের সন্ধানে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে আইন করে বছরে ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। ১০০ দিনের কাজে ভুয়া জব কার্ড জালিয়াতি চলছে রাজ্যের তৃণমূল পরিচালিত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী জেলে। ওই বিভাগের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন। শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকায় হাজার হাজার বিদ্যালয় শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বাইরের রাজ্যে চলে যাচ্ছে।

সংবিধান রক্ষা ও তার সঙ্গে যুবক, মহিলা, কৃষক, শ্রমিক, দলিত, আদিবাসী, পিছড়ে বর্গ, বয়স্ক নাগরিক, অল্প সংখ্যক, সংখ্যালঘু সকলের জন্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ২০২২-২৩ সালে কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত চার হাজার কিমি পায়ে হেঁটে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' করেন। এবছর ১৪ জানুয়ারি মণিপুর থেকে তিনি শুরু করেন 'ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রা।' ৬৭০০ কিমি পথ অতিক্রম করে তিনি ১৭ মার্চ মুম্বাই পৌঁছন। কংগ্রেস, সমাজবাদী দল ও বামপন্থী দলগুলি, আঞ্চলিক দলসমূহ সহ ৪১ টি দলের 'ইন্ডিয়া' জোট গঠিত হয়েছে। কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধী তাঁদের নির্বাচনী ইস্তেহারে দেশবাসীর জন্য পাঁচটি বিস্তৃত কর্মসূচি যথা যুবক, নারী, কৃষক, শ্রমিক ও ভাগীদারি ন্যায়ের আওতায় ২৫ টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা দেশের দক্ষিণ থেকে উত্তর বিভিন্ন রাজ্যে আসন সমঝোতা করে লড়াই করছে ও বিজেপিকে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। হিন্দী বলয়ের কয়েকটি রাজ্য ছাড়া বিজেপি দলের আসন সংখ্যা অতি সীমিত। দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করতে, দেশের অর্থনীতি প্রধানমন্ত্রীর পুঁজিপতি মিত্রদের হাত থেকে উদ্ধার করতে, বেকারী ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবির সমর্থনে এই রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের কংগ্রেস ও বামপন্থী প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়ী করুন।

*সংবিধান ও ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ রক্ষাকারী গণ মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রচারিত।*

## মোদীর বিদায় দেরি নেই

ভোট নয়, নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমা চাওয়া উচিত। তাঁর দশ বছরের রিপোর্ট কার্ড আমাদের জাতি, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি; ভারতের শরীরে একটি গভীর ক্ষত। গত ৫ বছরে ভারত কীভাবে বদলেছে তা দেখে আপনি হতবাক হবেন

১. ভারত এখন ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ বেকারত্বে ভুগছে (NSSO তথ্য)।

২. বিশ্বের ১০টি সবচেয়ে দূষিত শহর এখন ভারতে (WHO তথ্য)।

৩. ভারতীয় সেনা বাহিনীতে শহীদের সংখ্যা এখন ৩০ বছরে সর্বাধিক (ওয়াশিংটন পোস্ট)।

৪. ভারতে এখন ৮০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ আয় বৈষম্য (ক্রেডিট সুইস রিপোর্ট)।

৫. মহিলাদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ দেশ এখন ভারত (থমাস রয়টার্স সমীক্ষা)।

৬. ভারতীয় কৃষকরা ১৮ বছরের ফসলের সবচেয়ে কম দাম পাচ্ছে (WPI তথ্য)।

৭. মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর গরু সংক্রান্ত হিংসা এবং গণপ্রহার সর্বোচ্চ।

৮. ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক আয় বৈষম্যের দেশ (গ্লোবাল ওয়েলথ রিপোর্ট)।

৯ ভারতীয় টাকার অবস্থা এখন এশিয়ায় সবচেয়ে খারাপ (বাজারের তথ্য)।

১০. ভারত পরিবেশ সুরক্ষায় বিশ্বের তৃতীয় সবচেয়ে খারাপ দেশ (EPI ২০১৮)

১১. ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার, বিদেশী তহবিল এবং দুর্নীতি বৈধ করা হয়েছে (ফাইনান্স বিল ২০১৭)।

১২. মোদী প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি একটিও প্রেস কনফারেন্স করেননি।

১৩ ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার, সিবিআই বনাম সিবিআই, আরবিআই বনাম সরকার, এসসি বনাম সরকার বিরোধ ঘটেছে, কারণ মোদি সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ চান।

১৫. ভারতের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো ৪ জন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, 'গণতন্ত্র বিপদে পড়েছে'।

১৬. ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অফিস থেকে চূড়ান্ত গোপন প্রতিরক্ষা নথি (রাফায়েল যুদ্ধবিমান ক্রয় সংক্রান্ত) চুরি।

১৭. অসহিষ্ণুতা এবং ধর্মীয় চরমপন্থা ৭০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

১৮. ভারতীয় মিডিয়া ৭০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে পক্ষপাতদুষ্ট।

১৯. ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার, সরকারের সমালোচনা করলে দেশবিরোধী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হবে, যে মুহূর্তে আপনি এই মেসেজটি হোয়াটসঅ্যাপে ফরওয়ার্ড করবেন আপনার আশেপাশের কিছু মোদী ভক্ত আপনাকে দেশবিরোধী বলতে শুরু করবে। তবে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়। এখানে যা বলা হয়েছে তার একটিও মিথ্যা নয়। উপরের সমস্ত তথ্য ১০০ % যাচাই করা।

এটাই আমাদের ভারতবর্ষের বাস্তবতা। মোদি সরকার সাত দশকের অধিক সময়ের মধ্যে দেশের সবচেয়ে খারাপ সরকার।

২০২৪ সালের নির্বাচন নির্ধারণ করবে আমরা গণতন্ত্রে থাকব নাকি একনায়কতন্ত্রে।

## এসইউসিআই (সি) প্রার্থীর প্রতিরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর লোকসভা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী অক্ষয়কুমারকে বিজেপি ভয় দেখিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করায়। তাঁকে একটি হত্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। একই সঙ্গে এসইউসিআই (সি) প্রার্থী অজিত সিং পানওয়ারকে নানাভাবে চেষ্টা করেও নাম প্রত্যাহার করাতে পারেনি বিজেপি। সিপিআই পানওয়ারকে সমর্থন করে। দুই দল ওই কেন্দ্রের ২৭ লক্ষ ভোটারের কাছে লিফলেটের মাধ্যমে পৌঁছবে বলে জানালেও সিপিএম ভোটারদের কাছে আবেদন করেছে নোটায় ভোট দিতে যা বিস্ময়কর। সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়েছে, কংগ্রেস 'নোটা' তে ভোট দেবার জন্য আবেদন জানাবে।